The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp.149 - 164)
Published in July, 2025

সমাজকাঠামো বিনির্মাণে স্মৃতিকার মনুর ভূমিকা

ড. লিটন মিত্র *

প্রতিপাদ্যসার: মনুসংহিতা নামক স্মৃতিশাস্ত্র বিধিবিধানের কঠোর অনুশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এ শাস্ত্র নিয়ে অদম্য কৌতূহল রয়েছে মানুষের। একারণে কালের গহ্বরে বিলীন না হয়ে পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে মনুসংহিতা আজ অবধি সমাদৃত। যুগ পরিবর্তনের সময়কালে সমাজের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আর এ বিশৃঙ্খল সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতেই স্মৃতিকার মনুর আবির্ভাব। সমাজকে সুশৃঙ্খল করতে মনু প্রচলিত নিয়মের বলয় ভেঙ্গে কখনো কখনো কঠোর হয়েছেন। নারী ও শূদ্রদের ক্ষেত্রে তিনি বেদ পাঠ, শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসনের ক্ষেত্রে যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন তা বর্তমান সমাজ গ্রহণ করে নি বটে; তবে তাঁর প্রণীত রাজধর্ম, সৃষ্টিরহস্য, জন্মান্তরবাদ, সামাজিক বিধান, বিভিন্ন সংস্কারসমূহ সহ অন্যান্য বিষয়াদি যুগের পর যুগ ধরে আজও বহমান।

ভূমিকা

সর্বপ্রাচীন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতা হিসেবে খ্যাত মনু। তাঁর রচিত স্মৃতিশাস্ত্র 'মনুসংহিতা' গ্রন্থটি ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে খুব জনপ্রিয় এবং সমাদৃত। আর একারণেই বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণসমূহ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রসহ সংস্কৃত সাহিত্যের বহু গ্রন্থে মনু এবং মনুসংহিতা-র উল্লেখ রয়েছে। মনুর সমাজচিন্তা ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সুদীর্ঘ কালাবধি প্রভাব বিস্তার করেছিল। সর্বপ্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি-র মতে, প্রজাপতি (ব্রহ্মা) দ্বারা সৃষ্ট গ্রন্থের সারসংক্ষেপ করেছেন মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ। 'মনুসংহিতা' শাস্ত্রানুসারে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরায় সাতটি জাতি পর্যায়ক্রমে বসতি স্থাপন করেছিল, আর এই জাতিসমূহের আদি পিতা মনু। যেহেতু সাতটি জাতি ছিল; সুতরাং মনুও সাতজন ছিল। স্বায়ংভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত– এই সাতজন মনুর উল্লেখ রয়েছে 'মনুসংহিতা'-র প্রথম অধ্যায়ে।

বৈদিকোত্তর ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ধীরে ধীরে যখন বিশৃঙ্খলা শুরু হয়, তখনই স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। আর এসব স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের মধ্যে মনুস্মৃতি বা 'মনুসংহিতা' প্রধান ও অন্যতম। অনেকে মনে করেন, এ গ্রন্থ কেবল বিধিনিষেধের প্রাচীর ও শৃঙ্খল; কিন্তু আদতে তা নয়। তৎকালীন সমাজের পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে এই স্মৃতিশাস্ত্র। পরবর্তীকালে মনুসংহিতার প্রভাব কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়; বরং এ গ্রন্থের সামাজিক নিয়মকানুনের প্রভাব তখনকার ব্রহ্মদেশ, সিংহল, পারস্য, চীন, জাপান এবং সুদূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। 'মনুসংহিতা'র কাল নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য এবং দুরূহ বিষয়। মনু স্বয়ং এ গ্রন্থের উদ্ভব এবং বিকাশ সম্পর্কে বলেছেন–

> ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
> বিধিবদ্ গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্।।
> এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
> এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্বমেষোঽখিলং মুনিঃ।।
>
> –(*মনুসংহিতা*, পঞ্চানন। ১/৫৮-৫৯: ১১)।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা এই শাস্ত্র প্রস্তুত করে বিধানক্রমে স্বয়ং আমাকে অধ্যয়ন করিয়েছেন এবং আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করিয়েছি। মহর্ষি ভৃগু এই নিখিল শাস্ত্র আমার নিকট সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেছেন, তিনিই আপনাদের ইহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাবেন।

এ থেকে সহজেই অনুমেয়, ব্রহ্মা থেকে মনু; মনু থেকে মরীচিসহ অন্যান্য মুনি এবং ভৃগু এই শাস্ত্র অন্য সকল মুনিকে শোনাবেন অর্থাৎ তিন স্তরের মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থ বর্তমান রূপ ধারণ করেছেন। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ২০০ থেকে খ্রিষ্টাব্দ ২০০-এর মধ্যবর্তী কালে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বলতে বোঝায় সেসময়ের রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সামাজিক প্রেক্ষাপট– সবকিছুর সমন্বিত রূপ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যুগসন্ধিক্ষণের আমলে সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। আর হয়তো এ কারণেই সমাজের প্রয়োজনে বৃহত্তর গ্রন্থ হিসেবে মনুর 'মনুসংহিতা' নামক স্মৃতিশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। বৈদিক যুগ বিশেষ করে ঋগ্বেদের সময় থেকেই মনুর উল্লেখ রয়েছে। এখানে দেখা যায়– মনুর যজ্ঞার্হ দেবগণের কাছে প্রার্থনা করে বলা হচ্ছে– 'মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্মানবাদধি দূরং নৈষ্ট পরাবতঃ'। (*ঋগ্বেদ-সংহিতা*, রমেশচন্দ্র ৮ম মণ্ডল। ৩০/৩: ২৫৯)। অর্থাৎ পিতা মনু হতে আগত পথ হতে আমাদের ভ্রষ্ট করো না। এভাবে বৈদিক বিভিন্ন মন্ত্রের মধ্য দিয়ে মনুকে আদি পুরুষ রূপে পাওয়া যায়। এরপর একে একে মহাভারত, রামায়ণসহ সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় মনুর উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। মনুর দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ 'মনুসংহিতা'-র প্রভাব যে প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় সুদীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল এবং মনু স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন তা বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে মনু কিভাবে প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় অবদান রেখেছেন সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিতে স্মৃতিকার মনুর অবদান

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ রাজাই ছিলেন সেসময়ের সর্বেসর্বা। আর একারণে রাজার রাজনৈতিক বিচক্ষতা, দণ্ড প্রয়োগ, যুদ্ধনীতি, করনীতি, দুর্গ নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সম্যগ ধারণার উপর নির্ভর করতো রাজ্যের সুশাসন প্রতিষ্ঠা। মনু তাঁর 'মনুসংহিতা'য় রাজনীতির উপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে মনে করেছেন, সমাজকে সুসংবদ্ধ করতে হলে সঠিক নেতৃত্ব খুব প্রয়োজন। আর তাই মনু রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কোনো রাজ্যেই রাজা ব্যতীত শৃঙ্খলা থাকে না। রাজার সুশাসন না থাকলে চলতে থাকে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। যার ফলে প্রজারা নিপীড়নের স্বীকার হয় এবং রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়। আর রাজ্যও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। সেসময় ক্ষত্রিয়দের রাজা হওয়ার প্রচলন ছিল এবং সর্বাত্মকভাবে প্রজাপালনই ছিল রাজাদের প্রধান কর্তব্য। রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে রাজাকে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করতে হতো। রাজতন্ত্র সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে রাজার গুণাবলি এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে 'মনুসংহিতা'য় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন মনু। নিম্নে এসব বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

দণ্ডনীতি

রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজাকে পর্যায়ক্রমে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড– এই চারটি উপায় অবলম্বন করার কথা বলেছেন মনু। সাম হচ্ছে সমতা অর্থাৎ পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে বিরুদ্ধাচরণকারী রাজার সাথে বন্ধুত্ব করা। দানের মধ্য দিয়ে বিরোধী রাজাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে দান। বিরুদ্ধ রাজাকে দুর্বল করতে প্রজা, মন্ত্রী বা নিকটস্থ রাজার সাথে বিরূপ মনোভাব তৈরি করা হচ্ছে ভেদ। আর সর্বশেষ উপায় হচ্ছে দণ্ড অর্থাৎ সামরিক শক্তির প্রয়োগ। এই দণ্ড হচ্ছে রাজশক্তির মূর্ত প্রতীক। রাজ্য শাসনকালে রাজা সাম, দান ও ভেদ– এই তিন উপায়ে প্রজাপালনে ব্যর্থ হলে দণ্ড নামক উপায় অবশ্যই প্রয়োগ করবেন। এই দণ্ড প্রয়োগ করে রাজা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করে ধর্মকে সংস্থাপন করে এবং প্রজাদের পালন করে–

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমানাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ।।

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্মং বিদুর্বুধাঃ।।
–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ৭/১৭-১৮: ১৭৭-১৭৮)।

অর্থাৎ সেই দণ্ড রাজা, পুরুষ, নেতা, শাসক এবং চার আশ্রমের প্রতিভূ। দণ্ড সকল লোককে শাসন করে, দণ্ডই রক্ষা করে। লোক নিদ্রিত থাকলে দণ্ড জাগ্রত থাকে; পণ্ডিতগণ দণ্ডকে ধর্ম বলেছেন।

মনুর মতে, প্রজাপতি ব্রহ্মার আত্মজ হচ্ছে দণ্ড। তিনি রাজা সৃষ্টির পূর্বে দণ্ড সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মার সৃষ্ট এই দণ্ড প্রয়োগে রাজাকে সদা সচেতন এবং সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলেছেন। কেননা অন্যায়ভাবে এই দণ্ড প্রয়োগ করলে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি। দণ্ডের অপপ্রয়োগে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুতও হতে হয় আবার সুপ্রয়োগে দীর্ঘকাল সগর্বে নিজ আসনে অধিষ্ঠান করেন রাজা। আর এই দণ্ড প্রয়োগে অধিকারী সম্পর্কে মনু বলেছেন–

তস্যাহুঃ সম্প্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনম্।
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম-কামার্থকোবিদম্।।
শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা।।
–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ৭/২৬, ৩১: ১৭৮-১৭৯)।

অর্থাৎ সত্যবাদী, বিবেচক, প্রাজ্ঞ, ধর্ম, কাম ও অর্থে অভিজ্ঞ রাজাকে সেই দণ্ডের প্রবর্তয়িতা বলা হয়েছে। শুচি, সত্যপ্রতিজ্ঞ, শাস্ত্রসম্মতব্যবহারকারী, উত্তম সচিবাদি সহায়যুক্ত ও বুদ্ধিমান রাজা কর্তৃক দণ্ড প্রযুক্ত হতে পারে।

সর্বোপরি দেশ, কাল, শক্তি এবং বিদ্যা ঠিকমতো বিবেচনা করে অন্যায়কারী ব্যক্তিরা যে যেভাবে দণ্ড ভোগ করার যোগ্য রাজা ঠিক তার প্রতি সেইরূপ দণ্ড বিধান করবেন।

মন্ত্রী নিয়োগ

রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রী বা সচিবের দায়িত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের সুরক্ষা এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে রাজাকে দক্ষ মন্ত্রীর উপর নির্ভর করতে হয়। মনুসংহিতায় একজন রাজার জন্য সাত বা আটজন মন্ত্রী নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। আর এ নিয়োগ সম্পর্কে রাজাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেও বলা হয়েছে–

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান্।।
–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ৭/৫৪: ১৭৮-১৭৯)।

অর্থাৎ কুলক্রমাগত, শাস্ত্রজ্ঞ, বীর, যারা অস্ত্রবিদ্যা দৃষ্ট এমন লোক, উচ্চবংশজাত– এরূপ সাত-আটজন পরীক্ষিত ব্যক্তিকে সচিব করবেন।

মনুর রীতি অনুযায়ী, মন্ত্রীদের নিয়োগ দেবার পূর্বে একান্তে কথা বলে রাজা তাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হবেন। সকল মন্ত্রীর মধ্যে একজন ধার্মিক, বিদ্বান এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্রীকে নির্বাচন করবেন। এই মন্ত্রীকে অবশ্যই অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হতে হবে এবং রাজা এমন মন্ত্রীর সাথে সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন-দ্বৈধীভাব এবং আশ্রয়রূপ ষাড়্গুণ্যবিষয়ক গোপন মন্ত্রণা করবেন। এমনকি এই মন্ত্রীর উপর রাজা পূর্ণ আস্থা রেখে রাজ্যের কার্যভারও ন্যস্ত করতে পারেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান বা উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা বা অন্য কোনো সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। তবে এই মন্ত্রী ব্যতীত অন্য মন্ত্রীদের সাথে কখনো গোপন বিষয়ে পরামর্শ না করার জন্য বলেছেন মনু।

দূত নিয়োগ

একজন রাজা কেবল নিজ রাজ্য সম্পর্কে ধারণা রাখলেই চলে না; বরং নিজ রাজ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিবেশী রাজ্যসমূহসহ বিভিন্ন রাজ্যের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে জানতে হয়। তাছাড়া গোপন তথ্য সরবরাহ, বিভিন্ন রাজার সঙ্গে

সন্ধি স্থাপন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপে একজন রাজা দূত নিয়োগ করে থাকেন। কোনো রাজ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দূতের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একজন দক্ষ দূত নির্ণয় করতে পারেন নিজ রাজ্যের রাজার সাথে অন্য রাজাদের মনোভাব কেমন, কখন সন্ধি বা যুদ্ধ করা প্রয়োজন। এসব কারণে দূত নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজাকে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। রাজার পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য নির্ভর করে এই দূতের উপর। 'মনুসংহিতা'য় এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত রয়েছে। দূত নিয়োগ বিষয়ে মনু বলেছেন–

দূতঞ্চৈব প্রকুর্বীত সর্বশাস্ত্রবিশারদম্।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতম্।।
অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ৭/৬৩-৬৪: ১৮২)।

অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী, ইঙ্গিত, আকার ও করাস্ফালনাদিক্রিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, শুচি, দক্ষ ও উচ্চকুলজাত ব্যক্তিকে দূত নিযুক্ত করবেন। রাজার অনুরক্ত, শুচি, দক্ষ, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, দেশকালজ্ঞ, রূপবান্, নির্ভীক, বাগ্মী দূত প্রশংসিত হয়।

দূত রাজাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করেন। আবার প্রয়োজনবোধে রাজ্যের হিতার্থে ভেদ সৃষ্টি করে বিগ্রহ ঘটানোর কাজও দূত করে থাকেন। তিনি প্রতিপক্ষ রাজার অনুচরবর্গের গুপ্ত-ইঙ্গিত, গুপ্ত আচরণ প্রভৃতির দ্বারা বিরুদ্ধ রাজার অভিপ্রেত কাজ সম্পর্কে জানতে পারেন। এভাবে রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে দূত নিরলস হয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

দুর্গ নির্মাণ

একজন রাজা যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন তখনই দুর্গ প্রয়োজন হয়। কেননা রাজা নিজেও জানেন না যুদ্ধের স্থায়িত্ব সম্পর্কে। সুতরাং তাঁকে দীর্ঘকালীন নিজের সুরক্ষা, যুদ্ধের সরঞ্জামদি, যুদ্ধে অপর পক্ষকে পরাজিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ফাঁদ বা কৌশল অবলম্বন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের দুর্গ নির্মাণ করতে হয়। রাজা ও রাজ্যের সুরক্ষার জন্য মনু ছয় প্রকার দুর্গের কথা বলেছেন–

ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরান্।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ৭/৭০: ১৮২)।

অর্থাৎ ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, জলদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, নৃদুর্গ, বা গিরিদুর্গ আশ্রয় করে নগরে বাস করবেন।

এসব দুর্গের মধ্যে রাজা একটি দুর্গে পরিবার-পরিজন সহ বসবাস করবেন। দুর্গটি চারিদিক দিকে অনেক বেশি সুরক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। খাদ্য ও পানীয়ে ভরপুর থাকবে যেমন আবার যুদ্ধের উপকরণাদিও যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হবে। মনুর এমন সুচিন্তিত মতামত বর্তমানসময়ে সগর্বে বিদ্যমান।

করদান পদ্ধতি

রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমৃদ্ধ কোষাগার রাজার প্রধান আশ্রয়। একারণে প্রজাদের কাছ থেকে যথাযথ কর আদায় করা খুব প্রয়োজন। তবে কর আদায়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন কোনো প্রজার মধ্যে যেন অসন্তোষ সৃষ্টি না হয়। মনু অল্প অল্প করে বার্ষিক কর গ্রহণের কথা বলেছেন। তিনি সুষ্ঠুভাবে কর আদায় প্রসঙ্গে বলেছেন–

সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্তেত পিতৃবন্নৃষু।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ৭/৮০: ১৮৪)।

অর্থাৎ রাষ্ট্র থেকে বাৎসরিক রাজস্ব বিশ্বস্ত লোক দিয়ে আদায় করবেন। এ বিষয়ে শাস্ত্র অনুসরণ করবেন, প্রজাদের কাছে পিতার মতো থাকবেন।

যার যেমন সামর্থ্য তাই বুঝেই কর নির্ধারণ করতে হবে। রাজকোষ সমৃদ্ধ করতে গিয়ে প্রজাদের নিপীড়ন করা যাবে না। সমাজে বসবাসরত সকল পেশার প্রজা কর প্রদান করবে। মনু তাঁর 'মনুসংহিতা'য় প্রয়োজনে করমুক্তির কথাও বলেছেন–

ম্রিয়মানোহপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্।
ন চ ক্ষুধাহস্য সংসীদেচ্ছোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্।।
–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ৭/১৩৩: ১৯০)।

অর্থাৎ রাজা মুমূর্ষু হলেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থেকে কর গ্রহণ করবেন না। তার রাজ্যে বাস করে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় যেন পীড়িত না হন।

ব্রাহ্মণ রাজ্য এবং রাজার আয়ু, সম্পত্তি এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যহ ধর্মানুষ্ঠান করবেন বলে রাজা তাকে রক্ষা করবেন এমনটাই মনে করেন মনু, এমনকী অন্যথায় রাজা ক্ষুধাক্লিষ্ট হবেন বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে পাচক, কর্মকার, শূদ্রদের করমুক্ত করে কখনো কখনো বিনা বেতনে কর্ম করানোর উপদেশ দিয়েছেন মনু। সব মিলিয়ে মনু রাজাকে কার্য বিবেচনা করে কর আদায়ের ক্ষেত্রে কঠোর ও কোমল হতে বলেছেন।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে মনুর অবস্থান

মনু সমাজজীবন থেকে বিশৃঙ্খলা দূর করার লক্ষ্যে মানবজীবনকে খুব কঠোর অনুশীলনের পরামর্শ দিয়েছেন। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তিনি বিভিন্ন বিধি আরোপ করেছিলেন। তাঁর 'মনুসংহিতা' নামক স্মৃতিশাস্ত্রে মানুষের জীবনকে শৃঙ্খলার বেড়াজালে আবদ্ধ করতে তিনি 'চতুর্বর্ণ' ও 'চতুরাশ্রম' সৃষ্টি করেন যা সমাজ জীবনকে বেশ আলোড়িত করে এবং তা পরবর্তীকালেও বেশ জনপ্রিয়তা পায়।

চতুর্বর্ণ

বৈদিক সমাজের চতুর্বর্ণ থাকলেও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় মনুর যুগে। মনুসংহিতার সমাজের প্রধান ভিত্তি ছিল চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম। চতুর্বর্ণ হচ্ছে: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র- এই চার ধরনের জাতি যা কিনা কর্মের বা পেশার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই চার বর্ণের মধ্যে শূদ্রদের কোনো উপনয়ন ছিল না বলে 'একজাতি' এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের উপনয়নের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বার জন্ম হয় এমন বিশ্বাস প্রচলিত থাকায় তারা 'দ্বিজাতি' বলে খ্যাত ছিল। মনুসংহিতার যুগে জাতিভেদ নির্ণীত হতো জন্মের মধ্যে দিয়ে। তবে শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টত্ব নির্ধারিত হতো গুণ ও কর্মের দ্বারা।

ব্রাহ্মণ

চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিল শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদের প্রধান কাজ ছিল অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। মনু ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে বলেছেন- জন্ম থেকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। তবে যিনি বিদ্বান তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।।
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ।।
–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ। ১/৯৬-৯৭: ৮৫)।

অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাদের প্রাণ আছে, তারা শ্রেষ্ঠ; প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে আবার মানুষ এবং মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। আর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিদ্বান, বিদ্বানদের মধ্যে কৃতবুদ্ধি, কৃতবুদ্ধিদের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণ এবং কর্তব্যপরায়ণদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞগণ।

সমাজের শিক্ষা দান এবং পৌরোহিত্য করার দায়িত্ব মূলত ব্রাহ্মণের উপর ন্যস্ত ছিল। সকলের কাছে চারিত্রিক গুণাবলির দ্বারা তারা শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি মনু সর্বদা সদয় ছিলেন বলা যায়। প্রতিটি পরিস্থিতিতে তিনি ব্রাহ্মণ জাতিকে রক্ষা করতে চেয়েছেন, তাঁদেরকে রেখেছেন সমাজের উচুঁ স্তরে। ব্রাহ্মণের যদি নিজ পেশা দ্বারা জীবিকানির্বাহ না হয় সেক্ষেত্রে অন্য বর্ণের পেশা গ্রহণের বিধান রেখেছেন তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রে–

অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্মেণ স হাস্য প্রত্যনন্তরঃ।।
উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেত্তবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাম্।।
–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ। ১০/৮১-৮২: ১৬৫)।

অর্থৎ ব্রাহ্মণ উক্ত স্বকর্ম দ্বারা জীবনধারণে অক্ষম হলে ক্ষত্রিয়ধর্ম দ্বারা জীবিকানির্বাহ করবেন। কারণ সেই ধর্ম তার অব্যবহিত। (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়) উভয়ের বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করতে না পারলে কি করে হবে? তাহলে কৃষি ও গোপালন অবলম্বন করে বৈশ্যের জীবিকাদ্বারা ব্রাহ্মণ জীবন ধারণ করবেন।

মনু যেহেতু ব্রাহ্মণ জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন তাই তাদের দাসবৃত্তি বা হীন কোন কাজ না করার জন্য বলেছেন। ব্রাহ্মণ যদি বেদজ্ঞানী না হয় এবং অযোগ্য বৃত্তিসমূহের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে তবে তাকে শূদ্র বলে গণ্য করার জন্য বলেছেন।

ক্ষত্রিয়

ক্ষত্রিয়ের কাজ সম্পর্কে মনু বলেছেন–

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।।
–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ। ১/৮৯: ১৬৯)।

অর্থৎ ক্ষত্রিয়ের কর্ম লোকরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অত্যাসক্তির অভাব।
সমাজের রক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন ক্ষত্রিয়রা। প্রজাপালন এবং দেশকে সুরক্ষা দেয়াই তাদের প্রধান দায়িত্ব। এমনকি বহির্শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজ রাষ্ট্রকে সুরক্ষা দিতে যুদ্ধ করতে তারা দ্বিধা করতেন না। কারণ যুদ্ধকে ক্ষত্রিয়রা তথা রাজা স্বধর্ম বিবেচনা করবেন এমনটাই বলেছেন মনু–

স্বধর্মো বিজয়স্তস্য নাহবে স্যাৎপরাঙ্মুখঃ।
শস্ত্রেণ বৈশ্যান্ রক্ষিত্বা ধর্মমাহারয়েদ্বলিম্।।
–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ। ১০/১১৯: ২৯৮)।

অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লাভ তার নিজধর্ম, যুদ্ধে তিনি পরাঙ্মুখ হবেন না। অস্ত্রদ্বারা বৈশ্যদের রক্ষা করে তিনি ধর্মসম্মত কর আদায় করবেন। মনু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের একত্রে যুক্ত হয়ে আদর্শ সমাজ গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

বৈশ্য

বৈশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ। ১/৯০: ৮৮)।

অর্থাৎ পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, সুদে অর্থ বিনিয়োগ ও কৃষি বৈশ্যের কর্ম।

পশুপালন ও কৃষিকাজ বৈশ্যদের প্রধান জীবিকা হওয়ায় ধান্য ও ধনহেতু তাদের জ্যেষ্ঠত্ব বিবেচিত হতো। এ কারণে তারা ধর্মবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যত্নবান থাকতেন এবং সকল জীবকে সযত্নে অন্ন দান করতেন।

শূদ্র

শূদ্রদের কর্তব্য সম্পর্কে মনু বলেছেন–

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ। ১/৯১: ৮৮)।

অর্থাৎ প্রভু শূদ্রের কিন্তু একটি মাত্র কর্ম নির্দেশ করলেন; তা হলো এই সকল বর্ণের অসূয়াহীন সেবা।

বৈদিক সভ্যতার বিভিন্ন ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজে শূদ্র জাতির অবস্থান সর্ব নিম্নে ছিল। তাদের এরূপ অবস্থানের কারণস্বরূপ বলা হয়েছে পূর্ব জন্মের পাপের ফলস্বরূপ শূদ্র পরিবারে জন্ম হয়। আর এই পাপ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে উচ্চ বর্ণের সেবা করে পূণ্য অর্জন করা। মনুসংহিতার সমাজে শূদ্রদের স্থান আরো দুর্বিষহ হয়েছে। তাদের সবদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বেদপাঠেও তাদের অধিকার ছিল না। মনুসংহিতায় নারী ও শূদ্রদের ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যর বিষয়াদি যুক্ত করতে দেখা যায় যা কিনা অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রে অনেকটাই মৌন বা শিথিল। মনুসংহিতার আরোপিত অনুশাসনসমূহের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থায় মূল ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল উচ্চ বর্ণের হাতে। এরই ফলশ্রুতিতে সব দিক থেকে বঞ্চিত হয়েছে শূদ্র জাতি।

চতুরাশ্রম

'মনুসংহিতা'য় চতুর্বর্ণের পাশাপাশি চতুরাশ্রমের কথা বলা হয়েছে যা তখনকার সমাজে বসবাসরত মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস– এই চারটি চতুরাশ্রম সম্পার্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ব্রহ্মচর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য– এই তিন বর্ণের জীবন চারটি আশ্রম দ্বারা সুবিন্যস্ত। প্রথম আশ্রম 'ব্রহ্মচর্য' অর্থাৎ বেদচর্যা ও বিদ্যাশিক্ষার কাল। মনুর মতে, জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালনের সময়–

চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ। ৪/১: ১১৭)।

অর্থাৎ আয়ুষ্কালের প্রথম চতুর্থ ভাগ দ্বিজ গুরুগৃহে বাস করে পরের দ্বিতীয় ভাগ বিবাহিত অবস্থায় গৃহে বাস করতেন।

ব্রহ্মচারী হওয়ার পূর্বে উপনয়ন সংস্কার বাধ্যতামূলক ছিল। গুরু তার ছাত্রকে গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে বেদদীক্ষা দিতেন। উপনয়নের পর বালকের দ্বিতীয় জন্ম হতো এবং তখন তিনি 'দ্বিজ' নামে পরিচিতি পেতেন। মনু উপনয়নের জন্য বয়স নির্ধারণ করে দিয়েছেন । যেমন ব্রাহ্মণের ১৬ বছর, ক্ষত্রিয়ের ২২ বছর এবং বৈশ্যের ২৪ বছর। এর মধ্যে উপনয়ন না হলে তাদেরকে ব্রাত্য (অপবিত্র) বলা হতো। ব্রাত্যরা সমাজের চোখে নিন্দার পাত্র হতেন।

ব্রহ্মচর্যের সময় নানারকম ব্রত পালনের বিধান দিয়েছেন মনু। এছাড়াও মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক সকল বেদ এবং উপনিষদ পাঠ করতে হতো। কঠোর অনুশীলনের পরই একজন ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করতে পারতেন। গুরুর অনুমতি সাপেক্ষে সমাবর্তন সমাপ্ত করে স্নাতক ব্রহ্মচারী স্বগৃহে ফিরে যেতেন। মনুর স্মৃতিশাস্ত্রে তিন ধরনের স্নাতকের পরিচয় মেলে–

১. বেদস্নাতক অর্থাৎ যারা বেদাধ্যায়ন সমাপ্ত করেছেন।
২. বিদ্যাস্নাতক অর্থাৎ যারা বেদ-বিদ্যার অর্থজ্ঞান লাভ করে বিদ্যা শেষ করেছেন।
৩. ব্রতস্নাতক অর্থাৎ যারা ৩৬ বছর ধরে তিন বেদ অধ্যয়ন ও বেদার্থ বিচার করেছেন।

'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' নামে শিক্ষার্থী সম্পর্কে মনু বলেন–

যদি ত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে।
যুক্ত পরিচরেদেনমাশরীরবিমোক্ষণাৎ।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ। ২/২৪৩: ৮৩)।

অর্থাৎ যিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাস প্রার্থনা করেন, গুরুকুলে বাস করত দেহমুক্তি পর্যন্ত গুরুশুশ্রূষাদি করা তার একান্ত কর্তব্য।

গার্হস্থ্য

মনু চারটি আশ্রমের মধ্যে 'গার্হস্থ্যাশ্রম'কে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। একজন স্নাতক ব্রহ্মচারী তার গুরুগৃহে শিক্ষাজীবন শেষ করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন–

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদংবাপি যথাক্রমম্।
আবিপ্লুতব্রহ্মচর্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ। ৩/২: ৮৫)।

অর্থাৎ বেদসমূহ, বেদদ্বয় বা একটি বেদ যথাক্রমে অধ্যয়ন করে অস্খলিতব্রহ্মচর্য ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে বাস করবে।

গৃহে প্রবেশের পর গুরুর অনুমতি নিয়ে স্নানপূর্বক যথাবিধি সমাবর্তন করে সুলক্ষণযুক্ত সবর্ণ কন্যাকে বিবাহের মধ্য দিয়ে গার্হস্থ্য জীবনের সূত্রপাত ঘটে। মনু 'গার্হস্থ্য' নামক এই আশ্রমেও কঠোর অনুশাসন রেখেছেন। গৃহস্থের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে ছিল আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে সকলের ভোজন শেষে অবশিষ্ট যা থাকবে তা-ই ভোজন করা। তাকে অধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ ও অতিথিসেবার পর ধর্ম, অর্থ ও কাম– এই তিন বর্গের সেবাও যথাযথভাবে করতে হবে– এটাই ছিল গার্হস্থ্যাশ্রমে মনুর রীতি।

বানপ্রস্থ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য– এই তিন দ্বিজাতি গার্হস্থ্য জীবন যথাযথভাবে সম্পন্ন করে 'বানপ্রস্থ' নামক আশ্রমে প্রবেশ করবেন। গৃহস্থ গৃহ থেকে বনে প্রস্থান করে বলে এ আশ্রমের নাম 'বানপ্রস্থ'।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিবিধং স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেৎ তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।।
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ। ৬/১-২: ১৬৫)।

অর্থাৎ স্নাতক দ্বিজ নিয়মানুসারে এভাবে গৃহস্থাশ্রমে থেকে কৃতনিশ্চয় হয়ে এবং যথাযথভাবে জিতেন্দ্রিয় হয়ে বনে বাস করবেন। গৃহস্থ যখন নিজের চর্মশিথিলতা ও পক্বকেশ এবং পুত্রের সন্তান দেখবেন, তখন বনে আশ্রয় নিবেন।

গৃহস্থকে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে নিজ স্ত্রীকে পুত্রের দায়িত্বে রেখে বনে গমন করতে হয়। কিন্তু যদি স্ত্রী তার সঙ্গে বনে যেতে ইচ্ছা পোষণ করেন তাহলে তাকে সহ বনে যাবেন। বনে গিয়ে তাকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ করতে হবে। মৃগচর্ম বা বল্কল ধারণ করে প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করার কথা বলেছেন মনু। এছাড়া বন থেকে প্রাপ্ত খাবার খেয়ে এবং ব্রাহ্মণ বা অন্য বনবাসী দ্বিজের কাছ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে তাকে জীবনধারণ করতে হবে। বাহ্যিক শুদ্ধতার পাশাপাশি অন্তরের শুদ্ধির জন্যও তাকে আরো কিছু নিয়ম অনুশীলন করার কথা বলেছেন। কোনো ধরনের আরাম না করে নিয়মিত মাটিতে খড়কুটো বিছিয়ে ঘুমাবে। এসময় সবকিছুর সঙ্গ ত্যাগ করে জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটবে।

সন্ন্যাস

জীবনের সর্বশেষ আশ্রম 'সন্ন্যাস'। বিধি অনুসারে সকল অধ্যায় পেরিয়ে মোক্ষলাভের অভিলাষী হয়ে সন্ন্যাসে প্রবেশ করতে হবে। মনুর মতে–

অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্মতঃ।
ইষ্টা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।।
অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্টা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ। ৬/৩৬-৩৭: ১৬৯)।

অর্থাৎ যথাবিধি বেদসমূহ পাঠ করে ধর্মানুসারে পুত্রগণের জন্ম দিয়ে, যথাশক্তি যজ্ঞ করে মনকে মোক্ষে নিবিষ্ট করবেন। বেদপাঠ, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞ না করে মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করলে দ্বিজের অধোগতি হয়।

চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম ছাড়াও মনু বর্ণধর্ম সম্পর্কে অভিহিত করেছেন মনু। তিনি মনে করেন পবিত্র বৈদিক কর্মসমূহ দ্বারা দ্বিজগণের পবিত্র হওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- গর্ভাধান, জাতকর্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, নাভিচ্ছেদ, নামকরণ প্রভৃতি। প্রতিটি অনুষ্ঠানের পেছনে মঙ্গল কামনা, শৃঙ্গলা বজায় রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে এসব সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো;

গর্ভাধান

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে কিছু নিয়ম-রীতি মেনে চললে কল্যাণজনক সন্তান জন্ম দেওয়া সম্ভব বলে মনে করেন মনু। একারণে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবনে যেন বিপর্যয় না আসে, সন্তান জন্ম দেওয়া, গর্ভসঞ্চার না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ক যে আলোচনা করেছেন হওয়া তা-ই গর্ভধানের অন্তর্গত।

জাতকর্ম

প্রাঙ্নাভিবর্ধনাং পুংসো জাতকর্ম বিধীয়তে।
মন্ত্রবং প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পিষাম্।।
–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ। ২/২৯: ৬০)।

অর্থাৎ নাভিছেদের পূর্বে পুরুষের জাতকর্ম বিহিত। মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তার সুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন বিহিত। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবজাতকের বীজদোষ ও গর্ভদোষ জনিত পাপ মোচন হয়।

নামকরণ

সাধারণত জন্মের দশম অথবা দ্বাদশ দিনে তিথি ও শুভ মুহূর্ত দেখে নবজাতকের নামকরণ করা হতো। ব্রাহ্মণের নাম হবে শুভসূচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের নাম নিন্দাবাচক। আর উপনাম হবে যথাক্রমে শর্ম, বর্ম, ভূতি ও দাস- এমনটাই বলেছেন মনু।

অন্নপ্রাশন

মনুর মতে, জন্ম থেকে ষষ্ঠ মাসে শিশুর অন্নপ্রাশন করতে হবে।

উপনয়ন

উপনয়ন এ যুগের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্কার যা কিনা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে– এই তিন দ্বিজের ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয়। আট বছর বয়সে ব্রাহ্মণের, একাদশ বছর বয়সে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাদশ বছর বয়সে বৈশ্যের উপনয়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই আশ্রমে প্রবেশ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হিংসা, রাগসহ ইন্দ্রিয়ের সকল দোষ থেকে মুক্ত হয়ে ধ্যানযোগে আত্মদর্শনে সমর্থ হয়ে সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করা। আর এই চতুরাশ্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্মসাক্ষাৎ। সন্ন্যাসী একাকী নির্জনে বসবাস করেন এবং কেবল ভিক্ষা করে জীবনধারণ করে থাকেন।

বিবাহ

এ যুগে একজন গৃহস্থকে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতার আলোকে বলা যায় সেসময় বিভিন্ন ধরনের বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। তবে সব ধরনের বিবাহ সমাজে প্রশংসিত হতো না। মনু মনে করেন, সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য যেসব বিবাহ প্রথা ছিল সেভাবে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে স্বামী-স্ত্রী দুজনের পক্ষেই আনন্দদায়ক এবং তা তাদের গর্ভজাত সন্তানের পক্ষেও আনন্দদায়ক হয়। এর অন্যথা হলে সমাজে সন্তান সহ স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নিন্দার পাত্র হয়। এসব বিবেচনায় তিনি মোট আট ধরনের বিবাহের কথা বলেছেন। যেমন: ১. ব্রাহ্ম, ২. দৈব, ৩. আর্ষ, ৪. প্রাজাপত্য, ৫. আসুর, ৬.গান্ধর্ব, ৭. রাক্ষস ও ৮. পৈশাচ। তবে এর মধ্যে পৈশাচ বিবাহকে অধম বলেছেন আর ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে প্রথম ছয় প্রকার, ক্ষত্রিয়ের জন্য প্রথম চারটি ব্যতীত শেষের চারটি এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে রাক্ষস ছাড়া বাকী তিন প্রকার বিবাহ সমীচীন বলে মনে করেন। নিম্নে আট প্রকার বিবাহ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

১. ব্রাহ্ম বিবাহ

আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতিশীল্বতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ।।
–(*মনুসংহিতা*, পঞ্চানন। ৩/২৭: ২৮)।

অর্থাৎ বিদ্বান ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে নিজে আহ্বান করে, তাকে বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করে ও সম্মানিত করে কন্যাদান ব্রাহ্ম বিবাহ বলা হয়।

২. দৈব বিবাহ

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম কুর্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং বৈদং ধর্মং প্রচক্ষতে।।
–(*মনুসংহিতা*, পঞ্চানন। ৩/২৮: ২৮)।

অর্থাৎ যজ্ঞারম্ভকালে যজ্ঞকর্মরত পুরোহিতের নিকট অলঙ্কৃতা কন্যার উপযুক্তরূপে দানকে দৈব বিবাহ বলে।

৩. আর্ষ বিবাহ

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্মঃ স উচ্যতে।।
–(*মনুসংহিতা*, পঞ্চানন। ৩/২৯: ২৮)।

অর্থাৎ একটি বা দুইটি গোমিথুন বর থেকে ধর্মার্থে নিয়ে তাকে যথাবিধি কন্যাদান আর্ষ বিবাহ বলে কথিত।

৪. প্রাজাপত্য বিবাহ

সহোভৌ চরতাং ধর্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ।।
–(*মনুসংহিতা*, পঞ্চানন। ৩/৩০: ২৮)।

অর্থাৎ তোমরা দুজনে একত্র হয়ে ধর্মাচরণ কর– এই বলে বরকে অর্চনা করে তাকে কন্যাদান প্রাজাপত্য বিবাহ নামে কথিত।

৫. আসুর বিবাহ

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম উচ্যতে।।
–(*মনুসংহিতা*, পঞ্চানন। ৩/৩১: ২৮)।

অর্থাৎ (কন্যার পিত্রাদি) জ্ঞাতিদের এবং কন্যাকে যথাশক্তি ধন দিয়ে স্বেচ্ছানুসারে কন্যাগ্রহণ আসুর বিবাহ নামে কথিত।

৬. গান্ধর্ব বিবাহ

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।।
–(*মনুসংহিতা*, পঞ্চানন। ৩/৩২: ২৮)।

অর্থাৎ কন্যা ও বরের ইচ্ছানুসারে পরস্পর মিলন গান্ধর্ব নামে জ্ঞেয়; এই বিবাহ কামবশে মৈথুনেচ্ছায় ঘটে।

৭. রাক্ষস বিবাহ

হত্বা চ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাং।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে।।
−(*মনুসংহিতা*, পঞ্চানন। ৩/৩৩: ২৮)।

অর্থাৎ (বিরুদ্ধ কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণকে) হত্যা বা আঘাত করে, তাদের অঙ্গচ্ছেদ করে এবং (প্রাচীরাদি) ভেদ করে চিৎকার ও রোদনকারী কন্যার বলপূর্বক হরণ রাক্ষস বিবাহ নামে কথিত।

৮. পৈশাচ বিবাহ

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ।।
−(*মনুসংহিতা*, পঞ্চানন। ৩/৩৪: ২৮)।

অর্থাৎ নিদ্রিতা, মদ্যপানে বিহ্বলা বা প্রমত্তা (চরিত্ররক্ষণে অক্ষমা) কন্যাকে নির্জনে সম্ভোগ করলে সর্বাধিক পাপজনক ও নিকৃষ্টতম অষ্টম প্রকার বিবাহ পৈশাচ নামে কথিত।

সমাজে নারীদের ক্ষেত্রে মনুর বিধান

মনু মনে করেন প্রকৃতি কিংবা পুরুষ যে-কোনো একজনের দ্বারা সৃষ্টির রহস্য টিকে থাকতে পারে না। একারণে তিনি নারীকে লক্ষ্মীর সাথে তুলনা করেছেন এবং তিনি বলেন নারীর মাধ্যমেই পতি এবং পিতৃপুরুষের স্বর্গলাভ সম্ভব। আর তাই নারীদের গৃহসজ্জা সহ যাবতীয় গৃহকর্ম সুষ্ঠুভাবে পালনের বিধান রেখেছেন। নারীদের অন্তঃপুরে থেকে গার্হস্থ্য জীবনযাপনের কথা বলেছেন। অর্থাৎ পতিসেবা, সন্তান উৎপাদন, তাদের পরিপালন, অতিথি সৎকার প্রভৃতি সাংসারিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের পরামর্শ দিয়েছেন। এ ধরনের কাজ করলে নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার বিধান রেখেছেন।

তবে নারীদের স্বাধীনতা তিনি প্রায় সবদিক থেকে খর্ব করেছেন। শিক্ষা, বিবাহ, বৈধব্য জীবন বিষয়ে মনু নারীদের কঠোর বিধান আরোপ করে জীবন রুদ্ধ করে রেখেছিলেন। বৈদিক যুগে অদিতি, ইন্দ্রাণী, লোপামুদ্রা, পৌলমি, দেবযানী, বিশ্ববারা, কাদ্রু সহ প্রমুখ নারী কবির সরব উপস্থিতিতে সহজেই অনুমান করা যায় সেযুগে নারীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। অথচ মনু নারীশিক্ষার অধিকার রোধ করেছেন। তিনি নারীদের ক্ষেত্রে মন্ত্রহীন সংস্কার পালনের কথা বলেছেন।

অমন্ত্রিকা তু কার্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্।।
বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া।।
−(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ২/৬৬-৬৭: ৬৪)।

অর্থাৎ এসব সংস্কার স্ত্রীলোকের শরীর সংস্কারের জন্য যথাকালে ও যথাক্রমে অমন্ত্রক করণীয়। স্ত্রীলোকদের বিবাহবিধি বৈদিক সংস্কার বলে কথিত, পতিসেবা গুরুগৃহে বাস এবং গৃহকর্ম তাদের হোমরূপ অগ্নিপরিচর্যা।

মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ১৮ নং শ্লোকে কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে মন্ত্রপাঠহীন জাতকর্ম অনুষ্ঠানের কথা বলেন। কারণ তিনি মনে করেন নারী ধর্মের প্রমাণ রূপ শ্রুতি স্মৃতিরহিতত্ব হেতু অধর্মজ্ঞ এবং মিথ্যার ন্যায় অশুভ। বৈদিক যুগে নারীরা হোম করতে পারলেও মনুসংহিতায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বলা হয়েছে, কন্যা যুবতী হোম করতে পারবে না; এমনকি তারা হোম করলে নরকে পতিত হবে (১১/৩৬, ৩৭)।

নারীদের অধিকার বা স্বাধীনতা খর্ব করলেও মনু সমাজে প্রচলিত পণপ্রথার নিন্দা করেছেন। কন্যাদানের ক্ষেত্রে তিনি পিতাকে সামান্য শুল্ক বা পণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। একজন নারীর নিজ পতি ত্যাগ করাকে তিনি মেনে নেন নি; বরং রেখেছেন কঠোর শাস্তির বিধান। তাঁর মতে, স্ত্রীলোক নিজপতি পরিত্যাগ করে পরপুরুষের কাছে গমন করলে বহুলোক-সমাজে নিয়ে কুক্কুর দিয়ে খাওয়াতে হবে; আর সেই পাপকারী পুরুষকে তপ্তলৌহময় শয়নে শয়ান করিয়ে দাহ করতে হবে। পাপিষ্ঠ ভস্ম না হওয়া পর্যন্ত অগ্নিতে কাঠ নিক্ষেপ করতে হবে।

অন্যায়কারী স্ত্রীলোকদের প্রতি শাস্তির বিধান রেখে তৎকালীন সমাজে সকল প্রকার উচ্ছৃংখল তথা ব্যাভিচারতাকে নির্মূল করতে চেয়েছেন। তবে সামগ্রিক বিধান পর্যবেক্ষণ করে বলা যেতে পারে, নারীর স্বাধীনতাকে তিনি খর্ব করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মনুর অবদান

মনু তৎকালীন সমাজকে অর্থনীতি-সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেযুগের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ এবং পশুপালন। আর অর্থনীতি সুরক্ষার মূল দায়িত্ব ছিল বৈশ্যদের উপর। মনু বৈশ্যদের বীজ বপন ও জমির ধরন নিয়ে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন–

বীজানামুপ্তিবিচ্চ স্যাৎ ক্ষেত্রদোষগুণস্য চ।
মানযোগঞ্চ জানীয়াৎ তুলাযোগাংশ্চ সর্বশঃ।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ৯/৩৩০: ২৮৪)।

অর্থাৎ বীজবপন ও ক্ষেত্রের দোষ গুণ সম্বন্ধে এবং সকল (প্রস্থ-দ্রোণাদি) পরিমাণ ও তুলাদণ্ডে ওজন (বৈশ্য) জানবে।

সেসময় কৃষিক্ষেত্রে জমি চাষ করতে সীতা অর্থাৎ লাঙ্গল ব্যবহার করা হতো। আর কেউ এই লাঙ্গল চুরি করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। কেবল লাঙ্গল নয়; ক্ষেতের ধান অপহরণকারীকেও দণ্ডিত করা হতো। কৃষিকাজে বৈশ্যদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করছেন মনু। অন্যের জমিতে চাষ করতে নিষেধ করলেও কেউ যদি বনজঙ্গল পরিষ্কার করে অব্যবহৃত জমিতে চাষ করে ফসল ফলায় তাহলে ঐ জমি তারই হয়ে যাবে এমনটাই বলেছেন মনু (৯/৪৪)। সাধারণত বসন্ত ও শরৎ এই দুই ঋতুতে চাষাবাদ হতো। নীবার, ব্রীহি, শালিধান, মৃগ, তিল, মাষকলাই, রসুন, যব, আখ প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হতো। কৃষিকাজের সঙ্গে মনু নারী এবং পুরুষের সম্পর্কের তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, ক্ষেত্রভুতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্ (৯/৩৩)। অর্থাৎ নারীকে তিনি বলেছেন ক্ষেত্রস্বরূপ আর পুরুষ হচ্ছে বীজস্বরূপ। তাঁর মতে, কোনো পুরুষ পরস্ত্রীতে বীজ বপন করলে তা শীঘ্র নষ্ট হয় সুতরাং কৃষককে এক ক্ষেত্রে যথাকালে বীজ বপনের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন এর ফলাফল লাভজনক।

পশুপালন

এ যুগের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে পশুপালন। গবাদি পশুপালন করতে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো। অন্যের শস্যক্ষেত্র যেন নষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল করতে হতো। আর পশুপালন হিসেবে গরু বা মহিষ অগ্রাধিকার পেত।

শিল্পকার্য

নানা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন এ যুগের মানুষ। এ থেকে তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। 'মনুসংহিতা'য় সুবর্ণ খনি আবিষ্কার, বিভিন্ন কারখানা নির্মাণ, তামা ও লোহার তৈরি শিল্পদ্রব্য বিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, অর্থনৈতিক দিক থেকে তখনকার মানুষের জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে উন্নত হতে শুরু করেছিল। এছাড়াও অন্যান্য শিল্পকার্যের কদরও তখনকার সমাজে ছিল। যেমন: কারুশিল্পের দ্বারা শূদ্রেরা জীবননির্বাহ করতেন। কর্মকার লোহার তৈরি নানাদ্রব্য বিক্রি করতেন। কার্পাস তুলার বীজ, ঊর্ণা থেকে তৈরি সূতা দিয়ে তাঁতী বা তন্তুবায় কাপড় বোনার কাজ করতেন।

বাণিজ্য

বণিকেরা দেশ-বিদেশে জলপথে এবং স্থলপথে বাণিজ্য করতেন। মানুষের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানি করতেন তারা। অর্থোপার্জনের বড় উৎস ছিল এই বাণিজ্য। তবে দেশীয় পণ্য দেশের বাইরে রপ্তানি করতে বণিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন সরকার।

শুল্ক বা কর সংগ্রহ

শুল্ক বা কর আরোপ করার ব্যবস্থা ছিল এ যুগে। বণিকগণ বাণিজ্য করে লাভের অংশ রাজাকে দিতে হতো–

শুল্কস্থানেষু কুশলাঃ সর্বপণ্যবিচক্ষণাঃ।
কুর্যুরর্ঘং যথাপণ্যং ততো বিংশং নৃপো হরেৎ।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ৩/৩৯৮: ২৮৩)।

অর্থাৎ কার্যদক্ষ ও সকল পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শুল্কস্থানে পণ্যদ্রব্যের (গুণ দোষ বিচার করে সেই অনুসারে) মূল্যনির্ধারণ করবে; তারপর (লাভের) কুড়ি ভাগের এক ভাগ এক ভাগ রাজা (শুল্ক রূপে) গ্রহণ করবেন।

শুল্ক বা কর সংগ্রহের উপর রাজ্যের কোষাগার সমৃদ্ধ হয়। এ কারণে রাজার অধীনস্থ কর্মচারীরা সদা সচেতন থাকতেন এবং খোঁজখবর রাখতেন বাণিজ্য বিষয়ে।

মনুর 'মনুসংহিতা' অনুসারে ধর্মীয় অবস্থা

বৈদিক ভাবপরম্পরাকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে সায়ম্ভুব মনুর 'মনুসংহিতা'। এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্ম বা স্মার্তধর্ম। এ কারণে এই শাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রও বলা হয়।

অস্মিন্ ধর্মোঽখিলেনাক্তো গুণদোষৌ চ কর্মণাম্।
চতুর্ণামপি বর্ণনামাচারশ্চৈব শাশ্বতঃ।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ১/১০৭: ৫৪)।

অর্থাৎ এতে সমগ্র ধর্ম, কার্যসমূহের গুণ, দোষ ও চার বর্ণের শাশ্বত আচার লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মনুসংহিতায় সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হয়েছে প্রথম অধ্যায় এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে। সমগ্র জগতের স্রষ্টা পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা। ব্রহ্মার এক ভাগ পুরুষ এবং অপর ভাগ নারী। আর এই নারী থেকে সৃষ্টি হয় বিরাজ। আবার বিরাজ থেকে মনুর সৃষ্টি হলো। মনু সৃষ্টি করলেন প্রজাপতি স্বরূপ দশ জন মহামুনি। এরপর সৃষ্টি হলো একে একে সপ্ত মনু, বিভিন্ন শ্রেণির দেবগণ, মহান ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সর্প, বিহঙ্গ, বিভিন্ন শ্রেণির পিতৃগণ, বিদ্যুৎ, মেঘ, নক্ষত্র, বানর, মৎস্য, গোমহিষাদি, হরিণ, মানুষ, কীট, মক্ষিকা ও স্থাবর বৃক্ষাদি।

ঋগ্বেদের 'পরমসূক্তে' যেমন বলা হয়েছে ব্রহ্মা থেকেই চতুর্বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে তেমনি 'মনুসংহিতা'য় এরূপ আলোচনা রয়েছে।

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ১/৩১: ৪৬)।

অর্থাৎ লোকবৃদ্ধির জন্য পরমেশ্বরের মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করলেন।

ধর্মচর্চার মধ্য দিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মনু সদা সচেষ্ট ছিলেন। মনু মানুষের জীবনকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস– এই চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করলেন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মকে জানা এবং আত্মশুদ্ধিতা অর্জনের লক্ষ্যেই তিনি এরূপ বিভাজন করেছেন। কেননা ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মার শুদ্ধতা অর্জন করা সহজ নয়। শূদ্র ব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য– এই তিন দ্বিজেরা এই চারটি আশ্রম যথাযথভাবে পালন করতেন। শূদ্রের উপনয়ন হবার রীতি ছিল না বিধায় তারা বেদপাঠ ও শ্রবণ করতে পারতেন না আর চতুরাশ্রমের সুযোগও তাদের ছিল না।

সে সময় প্রত্যেক বর্ণের কর্মানুসারে ধর্ম নির্ধারিত হতো। যেমন– ব্রহ্মণের ধর্ম ছিল ৬টি (১/৮৮); অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও পরিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম (১/৮৯) লোকরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অত্যাসক্তির অভাব। বৈশ্যের ধর্ম (১/৯০) হচ্ছে পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, সুদে অর্থ বিনিয়োগ ও কৃষি এবং শূদ্রের ধর্ম– (১/৯১) সকল বর্ণের অসূয়াহীন সেবা।

তিনি ধর্মের চারটি লক্ষণের কথা বলেছেন–

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ২/১২: ৫৮)।

অর্থাৎ বেদ,স্মৃতি, সদাচার, নিজের প্রিয় কর্ম– ধর্মের এই চার প্রকার সাক্ষাৎ লক্ষণ।

এ সময়ে চতুর্বর্ণের ধর্মের পাশাপাশি চতুরাশ্রম পালনের মধ্য দিয়ে ধর্মচর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন মনু। ব্রহ্মচর্য জীবন যথাযথ ভাবে পালন করতে গুরুগৃহে প্রত্যহ ব্রহ্মাচারীকে বেদ অধ্যয়ন করতে হতো। এ সময় দ্বিজদের নানারকম ব্রতপালন, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদসমূহ এবং উপনিষদ পাঠ করতে হতো।

প্রত্যহ স্নান, শুদ্ধাভাবে দেবতা ও পিতৃতর্পণ, দেবতাদের পূজা, সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম, মধু ও মাংসবর্জন, গন্ধদ্রব্য সেবন ও স্ত্রীসংসর্গ না করা, অতিভোজন না করা, প্রাণিহিংসা না করা– এসব ছিল ব্রহ্মচারীর ধর্ম।

গৃহস্থকে গার্হস্থ্যাশ্রমে অধ্যয়ন, অধ্যপনা, যাগযজ্ঞ, অতিথিসেবা এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম– এ তিন বর্গের সেবা করার পরামর্শ দিয়েছেন। সংস্কার দ্বারা শরীর পবিত্র হয় বলে গৃহস্থকে দশবিধি সংস্কার পালনের নির্দেশ দিয়েছেন মনু। সেগুলো হলো: গর্ভাধান (৩/৪৫-৫০), জাতকর্ম (২/২৯) নামকরণ (২/৩০), নিষ্ক্রমণ (২/৩৪), অন্নপ্রাশন (২/৩৪), মাঙ্গলিক আচার (২/৩৪), চূড়াকর্ম (২/৩৫), উপনয়ন (২/৩৬-৪০), কেশান্ত (২/৬৫) এবং সমাবর্তন (৩/৩)।

বানপ্রস্থ নামক আশ্রমে দ্বিজেরা নীবার প্রভৃতি অন্ন বা অরণ্যজাত শাক, ফলমূল দিয়ে প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন, বেদাধ্যয়নে নিত্য নিযুক্ত থাকতেন এবং নিরহঙ্কার, মিত্রভাবাপন্ন, পরোপকারী, দানশীল, প্রতিগ্রহনিবৃত্ত ও সমস্ত প্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হবেন। এছাড়াও এ সময় হবনীয় দ্রব্য দিয়ে বিধি অনুসারে হোম করতে হতো। দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞও করার রীতি ছিল।

সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করে দ্বিজদের কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন পালন করতে হতে হতো। তবে পূর্বের তিনটি আশ্রমের ধর্ম যথাযথ ভাবে পালন করে সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করলে সেই দ্বিজের মোক্ষলাভের অভিলাষ পূরণ হতো না; বরং তিনি অধোগতি প্রাপ্ত হতেন।

এই আশ্রমের মূল ধর্ম হচ্ছে 'ন্যাস' অর্থাৎ যিনি সবকিছু ত্যাগ করে রিক্ত ও অকিঞ্চন হল তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। ইন্দ্রিয়দমন এবং রাগদ্বেষাদি দূরীভূত সন্ন্যাসীর অবশ্য পালনীয়। অহিংসা, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তির পরিহার, বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং উগ্র তপশ্চর্যা– এসবের দ্বারা তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করতে পারেন যা কিনা সন্ন্যাসীর জীবনের চরম লক্ষ্য–

সম্যগ্দর্শনসম্পন্নঃ কর্মভির্ন নিবধ্যতে।
দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারং প্রতিপদ্যতে।।
অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈর্বৈদিকৈশ্চৈব কর্মভিঃ।
তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্।।

–(*মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র। ৬/৭৪-৭৫: ১৭৩)।

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম দ্বারা বদ্ধ হন না; ব্রহ্ম জ্ঞানহীন ব্যক্তি কিন্তু (জন্ম মরণ রূপ) সংসার লাভ করেন। অহিংসা, বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গণের অনাসক্তি, বেদবিহিত কর্ম ও কঠিন তপস্যাদ্বারা ইহলোকে (মানুষ) ব্রহ্মে লীন হতে পারে।

মনুর ধর্মশাস্ত্রে জন্মান্তরবাদের কথা বলা হয়েছে। মানুষ যদি অধর্ম করে তবে মৃত্যুর পর কঠিন দেহ প্রাপ্ত হয়ে যমযাতনা ভোগ করে। এই যাতনা ভোগ করে পাপমুক্ত হয় এবং পুনরায় পঞ্চভূতের ভাগ অর্থাৎ মানবদেহ ধারণ করে। তবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ– আত্মার এই তিন গুণের দ্বারা ব্যাপ্ত মহত্তত্ত্ব সকল পদার্থে নিঃশেষে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মনু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে তিনি ছিলেন বদ্ধ পরিকর। একারণে কখনো কখনো তিনি কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। তাঁর প্রণীত চতুরাশ্রম, চতুর্বর্ণসহ বিভিন্ন সামাজিক বিধান আজও সমাজে সমাদৃত। নারীদের ক্ষেত্রে তিনি কখনো কঠোর আবার কখনো কোমল ছিলেন। নারীদের যেমন তিনি সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে পূজিত করেছেন আবার পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট বা সংসার ত্যাগী হলে ব্যাভিচারী আখ্যা দিয়ে কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছেন। তিনি মনে করতেন নারী জাতিকে রক্ষা করতে না পারলে সমাজের বিশৃঙ্খলা রোধ করা অসম্ভব। ব্রাহ্মণ জাতিকে সমাজের উঁচু স্থানে আসীন করেছেন। তিনি মনে করতেন রাজা ব্রাহ্মণকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করবেন; কারণ তারা দেবপূজা করে রাজ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। অন্যদিকে শূদ্রদের স্থান দিয়েছেন সমাজের নিম্ন স্তরে। তাদের প্রতি করেছেন অবিচার, বঞ্চিত করেছেন সমাজের সুযোগ-সুবিধা থেকে। মনু নারী এবং শূদ্রদের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রায় একই নিয়ম বিধান করেছেন। অর্থাৎ সমাজের নিচুঁ স্তরে এদের অবস্থান। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মনুর দৃষ্টিপাত ছিল প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। একজন বিচক্ষণ রাজার আচরণ, রাজার শত্রু-মিত্র সম্পর্কে ধারণা, দণ্ডের স্বরূপ কেমন হবে, দূত নিয়োগের ক্ষেত্রে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, রাজ্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে কর গ্রহণের মাত্রা কেমন হবে প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে তিনি বিধি আরোপ করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিধির ব্যবহার বহুকাল অবধি প্রচলিত ছিল, এমনকি আজও তা বহমান রয়েছে। মনুসংহিতার বহু শ্লোক মহাভারতের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রেও মনুসংহিতার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। মনুর সৃষ্টিরহস্য, জন্মান্তরবাদ, পূজাপদ্ধতি, বিভিন্ন সংস্কার পালন তথা ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ যে সেকালে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিল তা সহজেই অনুমেয়। আজও এসব অনুশাসন সমাজে প্রচলিত রয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, ভালো-মন্দ মিলিয়ে সমাজ গঠনে মনুর অবদান অপরিমেয়। তিনি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন যা সেসময়ের সমাজে যেমন আদৃত হয়েছে, পরবর্তী বহুকাল অবধি চলমান ছিল এমনকী বর্তমান সমাজেও এসব বিধানের ব্যবহার চর্চিত হয়।

তথ্যসূত্র

মনুসংহিতা। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩।

ঋগ্বেদ-সংহিতা (২য় খণ্ড)। রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত, ১৯৭৬।

মনুসংহিতা। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০২।